LEARN GEETA
तस्मात् योगी भवार्जुन

॥ श्रीहरि ॥
বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দেজগদ্গুরুম্।।

॥ गीता पढ़ें, पढ़ायें, जीवन में लायें ॥

॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বিবেচন সারসংক্ষেপ ॥

অধ্যায় 1: অর্জুনবিষাদযোগ

1/4 (শ্লোক 1-2), রবিবার, 02 জুন 2024

ব্যাখ্যাকার: গীতা প্রবীণ মাননীয়া রুপল শুক্লা মহাশয়া

ইউটিউব লিঙ্ক: https://youtu.be/PV_3llqnXh4

শাস্ত্র, মহাকাব্য মহাভারত এবং ভগবদ্গীতার সংক্ষিপ্ত ভূমিকা

ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায়টির নাম অর্জুন-বিষাদ-যোগ, যেখানে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বে অর্জুনের মানসিক বিষন্নতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম বিবেচন সভা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা নিবেদন এবং শুভ দীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শুরু হয়, যাতে আমরা পরমাত্মার আশীর্বাদ প্রাপ্ত করি এবং জ্ঞানের আলোতে ধর্মের পথে অগ্রসর হয়ে সৎ পথে পরিচালিত হতে পারি।

সদাশিব সমারম্ভাং ব্যাস শঙ্করাচার্য মধ্যমাম্।
অস্মদ্ আচার্য় পর্য়ন্তম্ বন্দে গুরু পরম্পরাম্।।

সর্বব্যাপী শিব ঠাকুর, মহর্ষি বেদব্যাস, গুরুদেব স্বামী গোবিন্দ দেব গিরি জী মহারাজ এবং সমগ্র গুরু পরম্পরার প্রতি শ্রদ্ধার সাথে প্রণাম করি।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ, গুরুর আশীর্বাদ এবং আমাদের পূর্ব জন্মের পুণ্যকর্মের ফলে আজ আমরা গীতা শিক্ষা লাভের এবং সেই অর্জিত অমূল্য জ্ঞান অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার সুযোগ পেয়েছি।

তাই আমাদের ভগবদ্গীতা থেকে অর্জিত জ্ঞানের চিন্তন এবং তার অনুশীলন, চালিয়ে যাওয়া উচিৎ। এই ভাবে একটা সময় আসবে যখন আমরা, সমাজকে আরো সেবা করার এবং ভগবদ্গীতার অমূল্য জ্ঞান সবার মধ্যে পৌঁছে দেবার জন্য, প্রস্তুত হয়ে যাবো।

অনেকে প্রশ্ন করেন যে গীতা পরিবারে কেন তৃতীয় লেভেলে(লেভেল-৩) এসে প্রথম অধ্যায় শেখানো হয়। আমাদের শাস্ত্রীয় শিক্ষা পদ্ধতিতে ক্রমের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো বিষয়ের অর্থ বোঝা এবং উপলব্ধি করা।

ধরুন, যদি আমাদের গীতা শিক্ষা প্রথম অধ্যায় থেকে শুরু করা হত, যেখানে অর্জুনের বিষন্নতার বর্ণনা করা হয়েছে এবং তার পরেই দ্বিতীয় অধ্যায়, যেখানে ভগবান স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ- এই প্রকার উচ্চ স্তরের ধারণা উপস্থাপনা করেছেন, তা

শেখানো হতো, তা হলে হয়তো আমাদের পক্ষে সেই জ্ঞান পুরোপুরি ভাবে উপলব্ধি করতে অসুবিধে হতো। তার ফলে হয়তো অনেকেই নিরুৎসাহিত হয়ে মাঝপথে তাদের শিক্ষার যাত্রা ত্যাগ করে দিতেন।

পরম পূজ্য স্বামী গোবিন্দ গিরি মহারাজ জী তাই পবিত্র ভগবদগীতাকে আরো বেশি মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেবার জন্য এই শিক্ষা ক্রম-ধারার কল্পনা করেছেন। আমরা ভাগ্যবান যে আমরা এই সহজ পদ্ধতিতে ভগবদগীতা শেখার সুযোগ পেয়েছি।

সেই অনুসারে নয়টি অধ্যায়ের পঠন শেষ করার পর, এখন প্রথম অধ্যায়, যা অর্জুন-বিষাদ-যোগ নামে পরিচিত, সেই অধ্যায়টি শেখা শুরু করেছি।

আমাদের ভগবদগীতা শেখার যাত্রায় লেভেল ১ এবং ২য়ে যে অধ্যায়গুলি পড়েছি তা হলো:

- দ্বাদশ অধ্যায়: **ভক্তি যোগ**।
- পঞ্চদশ অধ্যায়: **পুরুষোত্তম যোগ** -পরম সত্তার যোগ।
- ষোড়শ অধ্যায়: **দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ যোগ** - দৈব এবং আসুরী বৈশিষ্ট্যর মধ্যে পার্থক্য যোগ।
- নবম অধ্যায়: **রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ** - পরম বিজ্ঞান সমন্বিত সর্বাধিক গোপনীয় জ্ঞান যোগ।
- চতুর্দশ অধ্যায়: **গুণত্রয় বিভাগ যোগ** - তিনটি গুণের শ্রেণীবিন্যাসের যোগ।
- সপ্তদশ অধ্যায়: **শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ** - ত্রিবিধ শ্রদ্ধা, যজ্ঞ এবং তপঃ যোগ।

কেউ হয়তো ভাবতে পারেন যে দ্বাদশ অধ্যায় কেন প্রথমে শেখানো হলো। দ্বাদশ অধ্যায় ভগবদগীতার একটি ছোট অধ্যায় এবং এই অধ্যায়ে ঈশ্বর ভক্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভক্তি একটি সর্বব্যাপী আবেগ এবং মানুষ তা সহজেই উপলব্ধি করতে পারে। দ্বাদশ অধ্যায় শেখার পর, আমরা একজন একনিষ্ঠ ভক্তের বৈশিষ্ট্য চিনতে পারি এবং ভগবানের নিকটে পৌঁছোবার উপায় জানতে পারি।

উপরে উল্লেখিত অধ্যায় শেখার পর, আমরা গীতার পবিত্র এবং অমূল্য জ্ঞানের সাধক হিসাবে ভগবদগীতার উচ্চতর ধারণাগুলি বোঝার জন্য পাত্রতা অর্থাৎ যোগ্যতা অর্জন করি।

লেভেল - ৩ এ আমরা যে ছয়টি অধ্যায় শিখবো তা হলো:

- প্রথম অধ্যায়: **অর্জুন-বিষাদ-যোগ**-অর্জুনের বিষন্নতার যোগ
- তৃতীয় অধ্যায়: **কর্ম যোগ**-নিঃস্বার্থ কর্মের পথ
- চতুর্থ অধ্যায়: **জ্ঞান কর্ম সন্ন্যাস যোগ** - জ্ঞান এবং কর্মের শৃঙ্খলা যোগ
- পঞ্চম অধ্যায়: **কর্ম-সন্ন্যাস যোগ** - কর্মফলের প্রত্যাশা ত্যাগের যোগ।
- ষষ্ট অধ্যায়: **আত্ম-সংযম যোগ** যা ধ্যান যোগ নামেও পরিচিত - আত্ম-নিয়ন্ত্রণের যোগ।
- সপ্তম অধ্যায়: **জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ** - নির্গুণ ব্রহ্ম জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার যোগ।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ভগবদগীতার সমস্ত অধ্যায়কে যোগ বলা হয়। যোগ মানে সংযোগ বা সংযুক্ত হওয়া।
ভগবদগীতার মাধ্যমে, আমরা পরমাত্মার সাথে সংযুক্ত হতে শিখি এবং তাই গীতার অধ্যায়গুলিকে যোগ বলা হয়।

তা হলে প্রশ্ন ওঠে যে অধ্যায়ে যুদ্ধের আগে অর্জুনের বিষন্নতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সেই প্রথম অধ্যায়কে কেনই বা অর্জুন-বিষাদ-যোগ বলা হয়েছে।

এই অধ্যায়ে অর্জুন ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করছেন এবং তার এই মানসিক বিষাদবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার উপায়ের পরামর্শ চাইছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের যে এই ভালোবাসা এবং বিশ্বাস তা অর্জুন এবং ভগবানের মধ্যে যোগ বা সংযোগ স্থাপন করছে। এই কারণেই প্রথম অধ্যায়কেও যোগ বলা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন 'শিষ্যস্তেঽহম শাধি মাম্ ত্বাম্ প্রপন্নম্' অর্থাৎ তিনি ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করছেন এবং বলছেন যে তিনি তাঁর শিষ্য। অর্জুন তাঁর কাছে প্রার্থনা করছেন যে তিনি যেন

তাকে এই অবস্থায় কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ, সেই দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

ষোড়শ অধ্যায়ের চতুর্বিংশ শ্লোকে ভগবান বলছেন,

তস্মাচ্ছাস্ত্রং(ম্) প্রমাণং(ন্) তে, কার্য়াকার্য়ব্যবস্থিতৌ।

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং(ঙ্), কর্ম কর্তুমিহার্হসি৷৷১৬.২৪৷৷

এখানে তিঁনি বলেছেন যে, শাস্ত্র বা পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলি মানুষকে কি করা উচিৎ এবং কি অনুচিৎ, তা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে এবং সঠিক পথের নির্দেশনা দেয়। অতএব, মানুষের কেবল সেই ক্রিয়াগুলি করা উচিৎ, যা শাস্ত্র দ্বারা সঠিক ক্রিয়া হিসাবে নির্ধারিত করা হয়েছে।

সংস্কৃত ভাষায়, শাস্ত্রকে 'অনুসস্মতি ইতি শাস্ত্র' বলে বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ **যা শৃঙ্খলার চেতনা উদ্‌বুদ্ধ করে তাকে বলা হয় শাস্ত্র।**

শাস্ত্রই আমাদের শেখায়, "প্রাতঃকাল দারাভ্য, রাত্রি কাল পাদ্যন্তম্"। অর্থাৎ সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় পর্যন্ত আমরা নিজেকে কিভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে পারি, সেই বিষয়ে শাস্ত্র আমাদের নির্দেশনা দেয়। শাস্ত্র আমাদের আরও বোঝায় যে আমরা কি ভাবে মানবরূপ অর্জন করেছি এবং আমরা কি ভাবে এই মানবজীবন সার্থক এবং অর্থপূর্ণ করে তুলতে পারি।

তা হলে প্রশ্ন আসে যে, শাস্ত্র কি এবং তার সংজ্ঞা কি। কোন গ্রন্থকে শাস্ত্র হিসাবে গণ্য করা হবে? আমরা ভগবদ্গীতা, পুরাণ এবং অন্যান্য অনেক গ্রন্থকে শাস্ত্র বলে বিবেচনা করি। কিন্তু আমরা কীভাবে সেই গ্রন্থগুলোকে শ্রেণী বিভক্ত করব।

শাস্ত্র সম্পর্কে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা শাস্ত্রেই খুঁজে পাবো।

অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তারঃ।
পুরাণং ধর্মশাস্ত্রং চ বিদ্যা হ্যে তাশ্চতুর্দশ॥২৮॥

এই শ্লোকটি সেই চোদ্দটি বিদ্যা-স্থানম অর্থাৎ জ্ঞানের উৎসের বিবরণ দেয়, যার দ্বারা শাস্ত্র গঠিত হয়।

জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তরে আছে চারটি বেদ। তবে, বেদের মর্মগ্রহণ করার জন্য, বেদ শিক্ষা লাভের আগে আমাদের ছয়টি বেদাঙ্গ শিখতে হবে, যা ষট -অঙ্গ নামেও পরিচিত। শাস্ত্র গঠিত হয় চারটি বেদ, ছয়টি বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ ও ধর্ম-শাস্ত্রের দ্বারা। কিছু কিছু বিবরণে এটা বলা হয় যে শাস্ত্র, উপবেদ সহ আঠারোটি বিদ্যা-স্থানম দ্বারা, গঠিত হয়।

নিচের শ্লোকটি সেই ছয়টি বেদাঙ্গের পরিচয় দেয়, যা সঠিকভাবে বেদের মর্মগ্রহণ করতে সাহায্য করে।

□ ik□ □ , kalpo, vy□ kara□ a□ , nirukta chandas□, □ iti□

jyoti□ □ mayana□ chaksuhu □ a□ a□ go' veda uchayate

শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দসমিতিঃ।
জ্যোতিষময়নং চক্ষুঃ ষাড়ঙ্গোऽবেদ উচ্যতে॥

বলা হয় যে, বেদাঙ্গ হচ্ছে বেদের ছয়টি অঙ্গ। এই ছয়টি বেদাঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বেদ ও বেদাঙ্গের সম্মিলিত জ্ঞান, আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে।

নিম্নলিখিত ছয়টি বেদাঙ্গ বিদ্যা-স্থানম হিসাবে বিবেচিত হয়।

- **শিক্ষা শাস্ত্র** - উচ্চারণ বা ধ্বনিবিজ্ঞান। কিভাবে বেদ উচ্চারণ করতে হয়
- **কল্প সূত্র** - আচার পদ্ধতি
- **ব্যাকরণ** - ব্যাকরণ, বিশেষ করে সংস্কৃত ব্যাকরণ
- **নিরুক্ত** - ব্যুৎপত্তি, যার দ্বারা বেদে ব্যবহৃত শব্দের প্রসঙ্গ অনুযায়ী অর্থ প্রদান করা, কারণ একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ থাকতে পারে।
- **ছন্দ শাস্ত্র** - লয় শাস্ত্র। ভগবদগীতায় দুটি ছন্দ, অনুষ্টুপ্ ও ত্রিষ্টুপ্, ব্যবহার করা হয়েছে। তবে আরো অনেক প্রকার ছন্দ আছে যেমন বৈদিক ছন্দ, লৌকিক ছন্দ, মাত্রিক ছন্দ এবং ভার্নিক ছন্দ।
- **জ্যোতিষ শাস্ত্র** - জ্যোতির্বিজ্ঞান। সময় এবং স্থান সম্পর্কে জ্ঞান।

শাস্ত্রের আরও একটি বিভাজন আছে। শাস্ত্রের উৎসের উপর নির্ভর করে সেই শ্রেণীভাগ করা হয়।

- **শ্রুতি:** চতুর্বেদ।
- **স্মৃতি:** সাধারণ মানুষের বোঝার জন্য বেদের ধারণাগুলো সহজ পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
- **পুরাণ:** সমস্ত ধর্মীয় এবং বৈদিক পদ্ধতিগুলি গল্পের আকারে শেখানো হয়েছে। আমাদের অষ্টাদশটি পুরাণ আছে, ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, নারদীয়, মার্কন্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম, মৎস্য, গরুড় এবং ব্রহ্মাণ্ড।.
- **ইতিহাস:** মহাভারত এবং রামায়ণ, এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে যদিও ভগবদগীতা একটি অভঙ্গ শাস্ত্র গ্রন্থ, তবুও তার মধ্যে উপরে তালিকাভুক্ত চারটি শাস্ত্র বিভাগেরই বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

ভগবদগীতা বেদ ও উপনিষদের সারমর্ম। তাই গীতাকে শ্রুতি বলে গণ্য করা যেতে পারে। যেহেতু সাধারণ মানুষের বোঝার জন্য জটিল ধারণাগুলি সহজ ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাই গীতাকে স্মৃতি বলা যেতে পারে। ঋষি বেদব্যাস সমস্ত পুরাণের রচয়িতা, এবং তিনি মহাভারতেরও রচয়িতা, যার একটি অংশ হলো ভগবদগীতা, তাই ভগবদগীতাও একটি পুরাণ। মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের পঁচিশতম থেকে বিয়াল্লিশতম অধ্যায়ে সাতশোটি শ্লোক এবং আঠারোটি অধ্যায় রয়েছে, যাকে আমরা শ্রীমদ্ভগবদগীতা বলে জানি। এই কারণেই গীতাকে ইতিহাস বলেও গণ্য করা হয়।

যেহেতু আমরা জানি যে ভগবদগীতা মহাভারতের অংশ, তাই এই মহাকাব্য সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

মহাভারতের নামের পিছনে একটি খুব আকর্ষণীয় গল্প রয়েছে। **মহাভারতের আসল নাম হল জয় সংহিতা।**

প্রাচীনকালে বইয়ের পর্ব সংখ্যা অনুযায়ী তার নামকরণের ব্যবস্থা ছিল। সেই সময় ১ থেকে ৮ অবধি সংখ্যা ব্যবহার করা হতো এবং সেগুলোকে পুনরাবৃত্ত করা হতো। আর সংখ্যার স্থাপন বিপরীত ক্রমে করা হতো ।

সেই সময়ের গণনা পদ্ধতি অনুযায়ী, হিন্দি বর্ণমালায় 'জ' (**জ**য় সংহিতার প্রথম শব্দাংশ)-এর অবস্থান অষ্টম এবং 'য়' (জ**য়** সংহিতার দ্বিতীয় শব্দাংশ)-এর অবস্থান প্রথম। সুতরাং সেই অনুযায়ী মহাভারতের ৮১টি পর্ব থাকা উচিত ছিল। কিন্তু বিপরীত ক্রমে স্থাননির্ণয়ের নিয়মটি এখানে আসে। সেই নিয়মানুসারে এক আটের আগে আসে এবং এটি ৮১ নয় বরং ১৮ হবে । সুতরাং, এই নিয়ম অনুসারে মহাভারতের নাম হয় জয় সংহিতা (সংহিতা মানে মন্ত্রের সংগ্রহ) যার ১৮টি পর্ব।

তা হলে জয় সংহিতা মহাভারত হলো কি করে?

একটি গল্প আছে যে, একবার দেবতাদের মধ্যে আলোচনা হয় যে, জয় সংহিতা এবং চতুর্বেদের মধ্যে কোনটি বেশী ভারী গ্রন্থ। উভয় গ্রন্থকে দাঁড়িপাল্লায় তোলা হলে দেখা যায় যে জয় সংহিতার ওজন বেশী। **বেদের আর একটি নাম হচ্ছে ভারত। যেহেতু জয় সংহিতা, বেদের অর্থাৎ ভারতের চেয়ে বেশী ভারী ছিল, তাই গ্রন্থের ওজনের ভিত্তিতে জয় সংহিতা মহাভারত বলে পরিচিত হয়।**

যদিও **জ্ঞান সূত্র হিসাবে, বেদের অবস্থান উচ্চতম কারণ বেদ, জ্ঞানের সর্বোচ্চ উৎস হিসাবে চিহ্নিত। সুতরাং,**

এই পার্থক্য বজায় রাখার জন্য, মহাভারতকে পঞ্চবেদ অর্থাৎ পঞ্চম বেদও বলা হয়, যা ক্রমানুযায়ী চারটি প্রধান বেদের (ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদ) পরে আসে।

মহাভারত শুধু একটি অভঙ্গ গ্রন্থ নয়। গীতা প্রেসের বিস্তারিত মহাভারতের ছয়টি খণ্ড আছে এবং সংক্ষিপ্ত মহাভারতের দুটি খণ্ড আছে।

বলা হয়, মূল মহাভারতে ষাট লক্ষ শ্লোক ছিল। এই ষাট লক্ষ শ্লোকের মধ্যে তিরিশ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে স্থান পেয়েছে যা নারদ মুনি সেখানে পাঠ করেন। পনেরো লক্ষ শ্লোক পিতৃলোকে স্থান পেয়েছে যা অসিত-দেবল মুনিরা সেখানে পাঠ করেন। চোদ্দ লক্ষ শ্লোক যক্ষলোকে স্থান পেয়েছে যা শুকদেব মুনি সেখানে পাঠ করেন। বাকি **এক লক্ষ শ্লোক মনুষ্যলোক অর্থাৎ আমাদের বিশ্বকে দেওয়া হয়**। এই শ্লোকগুলি ঋষি বৈশম্পায়ন জন্মেজয়কে শুনিয়েছিলেন এবং সেই সূত্রে তা আজ আমাদের কাছে উপলব্ধ। যদিও, সেই এক লক্ষ শ্লোকের সবগুলো আজ আমাদের কাছে উপলব্ধ নয়।

বেদ ও পুরাণ রচনার পর ঋষি বেদব্যাস তার সৃষ্ট শ্লোকের গুণমান নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই, তিনি ভগবান ব্রহ্মার কাছে যান এবং তাঁর সৃষ্ট কাজের মান নিয়ে অসন্তোষের কথা বলেন। সেই সময় ভগবান ব্রহ্মা বেদব্যাসকে মহাভারত লেখার পরামর্শ দেন। যদিও এই পরামর্শটি বেদব্যাসের ভালো লাগে, কিন্তু তার মনে হয় যে লেখার সময় তার মনের চিন্তার স্রোতের গতি হয়তো তার লেখার গতি থেকে দ্রুত হবে। ভগবান ব্রহ্মা তখন তাকে পরামর্শ দেন যে তিনি যেন লিপিকার হিসেবে গণেশ ঠাকুরের সাহায্য নেন।

ঋষি বেদব্যাসের এই পরামর্শটি ভালো লাগে এবং তিনি গণেশ ঠাকুরের কাছে গিয়ে, লিপিকার হবার জন্য অনুরোধ করেন। গণেশ ঠাকুর প্রথমে এই কাজটি গ্রহণ করার বিষয়ে একটু অনিচ্ছুক ছিলেন। তাই, সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করে, তিঁনি বেদব্যাসের কাছে একটি শর্ত রাখেন এই বলে যে তাঁর কলম এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ হতে পারবে না, আর যদি তা হয়, তা হলে তিঁনি লেখা বন্ধ করে দেবেন। বেদব্যাস এই শর্ত মেনে নেন এবং গণেশ ঠাকুরকে একটি পাল্টা শর্ত দিয়ে বলেন যে গণেশ ঠাকুর তখনই লিখবেন যখন তিঁনি বেদব্যাসের রচনাটিকে পুরোপুরি ভাবে উপলব্ধি করে উঠতে পারবেন। গণেশ ঠাকুর এই শর্তে রাজী হয়ে যান। এরপর যখনই বেদব্যাসের আরও সময়ের প্রয়োজন হতো, তিনি একটি কঠিন শ্লোক গণেশ ঠাকুরকে শোনাতেন। গণেশ ঠাকুরের সেই শ্লোক বুঝে লিখতে সময় নিতেন আর এইভাবে তাঁর লেখনীর গতি কমে যেত। কথিত আছে যে, ষাট লক্ষ শ্লোকের মধ্যে **অষ্টআশি হাজার শ্লোক কঠিন শব্দ দিয়ে রচিত হয়, তাদের কুটশ্লোক বলা হয়**। এভাবেই বিশ্বের বৃহত্তম মহাকাব্য 'মহাভারত "রচনা করেছিলেন ঋষি বেদব্যাস আর তা লিখে ছিলেন গণেশ ঠাকুর।

ঋষি বেদব্যাস গণেশ ঠাকুরকে যেমন মহাভারত শুনিয়ে ছিলেন এবং তার পরে ঋষি বৈশম্পায়নও কুরু রাজবংশের বংশধর জন্মজয়কে ঠিক তেমনই শুনিয়েছিলেন।

কুরু বংশানুক্রম কিছুটা নিম্নরূপ:

রাজা শান্তনুর তিন পুত্র, যারা হলেন **ভীষ্ম পিতামহ, চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্য**। বিচিত্রবীর্যের দুই পুত্র ছিল, **ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু**। ধৃতরাষ্ট্রর স্ত্রী গান্ধারী এবং তাদের কৌরব নামে পরিচিত **একশোটি পুত্র**, যাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন **দুর্যোধন**।

পাণ্ডুর দুই স্ত্রী, কুন্তী যার পুত্র **যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন** এবং মাদ্রী যার পুত্র **নকুল ও সহদেব** ছিলেন। এই পাঁচ ভাই সমষ্টিতে পঞ্চ পাণ্ডব বলে পরিচিত।

পাণ্ডবদের প্রধান পত্নী ছিলেন দ্রৌপদী এবং সেই সূত্রে তাদের পুত্র **প্রতিবিন্ধ, সুতসোম, শতানীক, শ্রুতসেন, এবং শ্রুতকর্মা।**

অর্জুন ও সুভদ্রার পুত্র **অভিমন্যু,** যার পুত্র **পরীক্ষিত** এবং পরীক্ষিতের পুত্র ছিলেন **জন্মেজয়**।

ঋষি বৈশম্পায়ন, যিনি মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্য ছিলেন, তিনি জন্মেজয়কে মহাভারতের গল্পটি শোনান। জন্মেজয় তার পূর্বপুরুষদের এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের বীরত্ব সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ছিলেন।

ভগবান ব্রহ্মা বেদব্যাসকে দিব্য দৃষ্টির বর দিয়েছিলেন যার দরুন অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের প্রতিটি ঘটনা যেভাবে ঘটেছিল তা দেখার ক্ষমতা বেদব্যাসের ছিল। এই কারণেই ব্যাসদেবকে **ত্রিকালদর্শী** বলা হয়। এমনকি, মানুষের মনের কথা জানার ক্ষমতাও তাঁর ছিল।

বেদব্যাস যে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন তা প্রমাণিত হয় যখন ঋষি বৈশম্পায়ন মহাভারত পাঠ করার সময় জন্মেজয়কে বলেন যে, তিনি গ্রন্থে পড়ছেন ঋষি বৈশম্পায়ন অর্থাৎ তিনি নিজে, ভবিষ্যতে একদিন, জন্মেজয় নামে অর্জুনের এক বংশধরকে মহাভারত পাঠ করে শোনাবেন।

ব্যাসদেব পরে তার দিব্য দৃষ্টির শক্তি সঞ্জয়কে দিয়েছিলেন, যার সাহায্যে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধক্ষেত্রের কার্যধারা বর্ণনা করতে সক্ষম হন।

মহাভারতকে বাড়িতে না রাখার বিষয়েও একটি ভুল ধারণা রয়েছে। অনেকে মনে করেন যে মহাভারত বাড়িতে রাখলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ এবং ঝগড়া হবার সম্ভবনা থাকে। কিন্তু পরম পূজ্য গোবিন্দগিরি জী মহারাজের অভিমত হল, যারা মহাভারত বাড়িতে রাখেন না, তারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করেন, কারণ বাড়িতে মহাভারত থাকলে, পরিবারের সদস্যরা তা পড়বেন এবং এই গ্রন্থের অমূল্য জ্ঞান অর্জন করবেন। তার ফলে তারা দ্বন্দ্ব এড়ানোর প্রজ্ঞা(সুগভীর জ্ঞান) অর্জন করতে পারবেন।

মহাভারতে পাঁচ হাজার চরিত্র রয়েছে। বেদব্যাস মহাকাব্যটি এমনভাবে লিখেছেন যে প্রতিটি পাঠক এই গ্রন্থের কোনো না কোনো চরিত্রের সঙ্গে নিজের মিল খুঁজে পাবেন।

ভগবদ্গীতা, যা মহাভারতের একটি অংশ, এটি সৎ জীবনযাপনের জন্য একটি অমূল্য পথনির্দেশিকার পুস্তিকা। গীতার ওপর এক হাজার আটশোটি ভাষ্য লেখা হয়েছে। মনে রাখতে হবে এগুলি ভাষ্য, অনুবাদ নয়। অনুবাদকেও যুক্ত করলে এই সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

যদিও বাইবেল এমন একটি গ্রন্থ যা সর্বাধিক ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে, কিন্তু ভগবদ্গীতা হলো সেই গ্রন্থ যার আঠারোশোটি ভাষ্য এবং অগণিত অনুবাদ রয়েছে। বিনোবা ভাবে, মহাত্মা গান্ধী (যিনি দুটি ভাষ্য লিখেছেন), বাল গঙ্গাধর তিলকও গীতার ভাষ্য রচনা করেছেন । ভগবদ্গীতা চূড়ান্ত ভাবে আমাদের সংস্কৃতির সমৃদ্ধি প্রদর্শন করে।

ভগবদ্গীতা সম্পর্কে কয়েকটি আকর্ষণীয় পরিসংখ্যান:

সর্বমোট শ্লোক সংখ্যা - ৭০০

- ভগবান কৃষ্ণের কথিত শ্লোক: ৫৭৪
- অর্জুনের কথিত শ্লোক: ৮৪
- সঞ্জয়ের কথিত শ্লোক: ৪১ এবং
- ধৃতরাষ্ট্রের কথিত শ্লোক: ১ (প্রথম শ্লোকটি)

জগৎগুরু আদি শঙ্করাচার্যর মতে ভগবদ্গীতার প্রকৃত উপদেশ এবং আলোচনা দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশতম শ্লোক থেকে শুরু হয় কারণ এই শ্লোক থেকেই ভগবনের শিক্ষা প্রদান শুরু হয়। প্রথম অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জয় দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর বর্ণনা রয়েছে মাত্র।

1.1

ধৃতরাষ্ট্র উওয়াচ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে, সমবেতা য়ুয়ুৎসবঃ

মামকা: (ফ্) পাণ্ডবাশ্চৈব, কিমকুর্বত সঞ্জয়॥1॥

ধৃতরাষ্ট্র বললেন- হে সঞ্জয়! ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের ইচ্ছায় সমবেত আমার এবং পাণ্ডুর পুত্রগণ কি করল?

ধৃতরাষ্ট্রর তার নিজের পুত্র এবং তার ভাই পাণ্ডুর (**মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব**) পুত্রদের মধ্যে বৈষম্য করতেন। যদিও সাধারণত বলা হয় যে দ্রৌপদী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কারণ, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রর এই বৈষম্যমূলক ব্যবহারই যুদ্ধের আসল কারণ ছিল। মূল মহাভারত অনুসারে, দ্রৌপদী কখনও দুর্যোধনকে অপমান করেননি।

এই অনর্থর আসল কারণ ছিল ধৃতরাষ্ট্রের তার পুত্রদের প্রতি অন্ধ ভালবাসা এবং অপত্য স্নেহ। অন্যথায়, একজন বাবা কীভাবে তার ছেলেদের এই ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজ অনুমোদন করতে পারেন। পাণ্ডবদের প্রতি দুর্যোধনের চরম ঘৃণা সম্পর্কে তিনি ভালোভাবেই অবগত ছিলেন।

শৈশবকালে একবার দুর্যোধন ভীমকে বিষ প্রয়োগ করে নদীতে ফেলে দিয়েছিলেন। সেই সময়ে ভীমকে তার মাতামহ, নাগরাজ রক্ষা করেছিলেন এবং নাগরাজ ভীমকে দশসহস্র হাতির সমান শক্তি প্রদান করেছিলেন।

এখন আসুন আমরা এই শ্লোকের কয়েকটি শব্দের অর্থ দেখি:

ধর্মক্ষেত্র: পবিত্র ভূমি

কুরুক্ষেত্র: রাজা কুরু সেখানে তপস্যা করেছিলেন বলে জায়গাটি কুরুক্ষেত্র নামে পরিচিত।

সমবেত: একত্রিত

যুয়ুৎসব: যারা যুদ্ধ করার অভিলাষ রাখে

মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব: শাস্ত্রনিয়মুসারে, যদি ছোট ভাইয়ের মৃত্যু হয়, তখন তার সন্তানগণ বড় ভাইয়ের সন্তান বলে বিবেচিত হয়। অতএব, এই ক্ষেত্রে পাণ্ডুর মৃত্যুর পর, তার সন্তান অর্থাৎ পাণ্ডবদের, ধৃতরাষ্ট্রের নিজের সন্তান হিসেবে বিবেচনা করা উচিৎ ছিল। ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু সর্বদা পাণ্ডব এবং কৌরবদের মধ্যে পার্থক্য করতেন এবং কখনও পাণ্ডবদের তার পুত্র হিসাবে গণ্য করেননি, যদিও পাণ্ডবরা তাকে নিজেদের পিতার সম্মান দিয়েছিলেন।

সেই কুখ্যাত পাশাখেলার সময় যুধিষ্ঠির জানতেন, তিনি যা করছেন তা তাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তার নিজের চেতনাবোধ এবং তার নিজের আত্মীয়পরিজন, বন্ধুবান্ধব সবাই তাকে খেলা থেকে নিবৃত্ত হতে বলছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রও দেখছিলেন কিভাবে পাণ্ডবদের পতন ঘটছে, কিন্তু তিনি খেলা বন্ধ করার পরিবর্তে যুধিষ্ঠিরকে খেলা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করেন। যুধিষ্ঠির পিতৃতুল্য ধৃতরাষ্ট্রের কথার অবাধ্য হতে অপারগ ছিলেন, তাই তিনি খেলা পরিত্যাগ করার পরিবর্তে সেই খেলা চালিয়ে যান। এর পরে কী ঘটেছিল তা আমরা সবাই জানি।

এই শ্লোকে, ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধক্ষেত্রের ঘটনা জানতে আগ্রহী হয়ে সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করেন, "কিমকুর্বত সঞ্জয়", অর্থাৎ তারা কি করল, সঞ্জয়?

সঞ্জয় কিন্তু যুদ্ধের প্রথম দিন থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের ঘটনাগুলি রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বর্ণনা করেননি।

প্রকৃতপক্ষে, প্রথম দশদিন তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। একাদশ দিনে যখন ভীষ্ম পিতামহ শরবর্ষণে ভূপতিত হন, তখন সঞ্জয় হস্তিনাপুর ফিরে আসেন। এবং তখন ধৃতরাষ্ট্র তাকে উপরোক্ত প্রশ্নটি করেন এবং তখন সঞ্জয় যুদ্ধের শুরু থেকে কি হয়েছিল তা বর্ণনা করতে শুরু করেন।

সঞ্জয় জন্মগতভাবে একজন সুতপুত্র ছিলেন। জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি ঋষি বেদব্যাসের কাছে গিয়ে তার শিষ্য হওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। সঞ্জয়ের সেই জ্ঞান অর্জনের জন্য সামাজিক শ্রেণী না থাকে সত্ত্বেও, বেদব্যাস তাকে নিরুৎসাহিত করেননি।তিঁনি সঞ্জয়কে এই ধরনের জ্ঞান অর্জনের জন্য তার যোগ্যতা প্রমাণ করতে বলেন। সঞ্জয় যখন বেদব্যাসের দেওয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তখন বেদব্যাস তাকে তাঁর শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। পরে, সঞ্জয়ের অগ্রগতিতে খুশি হয়ে বেদব্যাস তার বর্ণ শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণে পরিবর্তন করে দেন এবং তাকে হস্তিনাপুর রাজ্যে মন্ত্রী

করেন। তারপর থেকেই সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের ব্যক্তিগত এবং বিশ্বস্ত সহকারী হয়ে ওঠেন। সঞ্জয়ের জীবন উত্থানের এই উদাহরণ প্রমাণ করে এবং মানুষকে অনুপ্রাণিত করে যে তপ ও জ্ঞানের শক্তি দ্বারা তারা নিজের জীবনে ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে।

মহাভারত সৃষ্টির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপে দেওয়া হলো।

রাজা শান্তনু গঙ্গার প্রেমে পড়েন এবং তাকে বিয়ে করতে চান। গঙ্গা এই শর্তে বিয়ের এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে রাজা তার কোনও কার্য নিয়ে কখনও প্রশ্ন করবেন না বা সেই কার্য করতে বাধা দেবেন না। যদি কখনো রাজা শান্তনু তাকে প্রশ্ন করেন বা তার কাজে বাধা দেন তবে গঙ্গা অবিলম্বে তাকে ছেড়ে চলে যাবেন।

সময়ের সাথে সাথে গঙ্গা একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন, কিন্তু তিঁনি সেই সদ্যজাত শিশুটিকে নদীতে ভাসিয়ে দেন। এই ঘটনা রাজা শান্তনুকে আঘাত করলেও, তিনি বিবাহপূর্ব শর্ত অনুযায়ী গঙ্গাকে এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করতে পারেননি বা তাকে বাধা দিতে পারেননি। গঙ্গা তাদের পরবর্তী ছয় পুত্রকেও জন্মের পরে একইভাবে নদীতে ভাসিয়ে দেন। যখন তিনি তাদের অষ্টম পুত্রকেও একইভাবে ভাসিয়ে দিতে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন শান্তনু আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে গঙ্গাকে এর কারণ জানতে প্রশ্ন করেন।

গঙ্গা তার প্রশ্নের উত্তর দেন কিন্তু শর্ত অনুযায়ী তিনি রাজা শান্তনুকে ছেড়ে চলে যান। তিনি রাজা শান্তনুকে জানান যে তার সেই আট পুত্র আসলে অষ্টবসু। বশিষ্ঠ মুনির অভিশাপে, তাঁরা মর্তলোকে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁদের অনুরোধে, সেই অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য গঙ্গা তাদের জন্মের পর এক এক করে নদীতে ভাসিয়ে দিতেন।

চলে যাওয়ার সময় গঙ্গা তাদের অষ্টম সন্তান দেবব্রতকে (পরে যিনি ভীষ্ম নামে পরিচিত হন) নিজের সাথে নিয়ে যান। তিনি রাজাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে দেবব্রত বড় হয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত করার পর তাকে তিনি রাজা শান্তনু কাছে ফিরিয়ে দেবেন। দেবব্রত বৃহস্পতির কাছ থেকে সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত করেন এবং পরশুরাম তাকে ধনুর্বিদ্যার প্রশিক্ষণ দেন।

একদিন রাজা শান্তনু লক্ষ্য করেন যে একটি ছেলে তীর নিয়ে গঙ্গার প্রবাহ বন্ধ করার চেষ্টা করছে। ছেলেটির সাহস দেখে তিনি মুগ্ধ হন এবং তার বংশপরিচয় জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। সেই সময় সেইস্থানে গঙ্গা আবির্ভূত হন এবং ছেলেটিকে শান্তনুর অষ্টম পুত্র দেবব্রত বলে পরিচয় দেন। তিনি দেবব্রতকে তার পিতার সাথে যাওয়ার অনুমতি দেন।

সময়ের সাথে সাথে শান্তনু নিঃসঙ্গ বোধ করতে থাকেন এবং মৎসকন্যা সত্যবতীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। তিনি সত্যবতীকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে তার বাবার কাছে যান। সত্যবতীর বাবা একজন বিচক্ষণ এবং দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তার মেয়ের স্বার্থ রক্ষার্থে বিয়ের জন্য সম্মতি দেওয়ার আগে রাজার কাছে একটি শর্ত রাখলেন যে শুধুমাত্র সত্যবতীর পুত্ররাই হস্তিনাপুরের ভবিষ্যৎ শাসক হতে পারবেন।

এই শর্তটি রাজা শান্তনুর পক্ষে গ্রহণযোগ্য ছিল না কারণ তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন দেবব্রত এবং ন্যায় অনুযায়ী তিনিই ছিলেন হস্তিনাপুরের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। তাই, তিনি সত্যবতীকে বিয়ে না করেই হতাশ হয়ে ফিরে আসেন।

পরে, দেবব্রত একজন গুপ্তচরের কাছ থেকে পুরো ঘটনার বৃত্তান্ত জানতে পারেন এবং সিংহাসনের ওপর তার সমস্ত অধিকার ত্যাগ করে ব্রহ্মচর্যের অতি কঠিন প্রতিজ্ঞা (ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা) গ্রহণ করেন। তিনি সত্যবতীর পুত্রদের এবং তাদের বংশকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতিও দেন। এই প্রতিজ্ঞার জন্য দেবব্রত ভীষ্ম নামেও পরিচিত ছিলেন। এরপর রাজা শান্তনু এবং সত্যবতীর বিবাহ হয়। সময়ের সাথে সাথে সত্যবতীর দুই পুত্র চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যের জন্ম হয়।

চিত্রাঙ্গদ একটি যুদ্ধে মারা যান এবং বিচিত্রবীর্য একজন দুর্বল ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু রাজ্যের তো একজন উত্তরাধিকারী প্রয়োজন, তাই তার কনে হিসেবে দেবব্রত কাশী মহারাজের তিন রাজকন্যাকে (অম্বা, অম্বিকা এবং অম্বালিকা) অপহরণ করে হস্তিনাপুর নিয়ে যান। অম্বা জানান যে তিনি ইতিমধ্যেই শাল্বরাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন এবং তার কাছে ফিরে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেবব্রতর কাছে অনুরোধ করেন।কিন্তু, শাল্বরাজ অম্বাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন কারণ ভীষ্ম তাকে অপহরণ করেছিলেন। ক্ষিপ্ত হয়ে অম্বা দেবব্রতকে অভিশাপ দেন যে তিনিই অর্থাৎ অম্বা, একদিন ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ হবেন।

অম্বিকা এবং অম্বালিকার বিচিত্রবীর্যের সাথে বিবাহ হয়, কিন্তু তবু তারা কোন উত্তরাধিকারীর জন্ম দিতে পারেন না। সত্যবতী তখন ভীষ্মকে সাহায্য করতে অনুরোধ করেন, কিন্তু ভীষ্ম তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে অস্বীকার করেন। তাই,

সত্যবতী বেদব্যাসের কাছে যান। বেদব্যাস ছিলেন ঋষি পরাশর এবং সত্যবতীর পুত্র এবং তাঁর জন্ম সত্যবতীর সঙ্গে রাজা শান্তনুর বিবাহের পূর্বে হয়।বেদব্যাস তার মাতার অনুরোধ মেনে নেন এবং তার বিশেষ ক্ষমতার সাহায্যে অম্বিকা ও অম্বলিকাকে পুত্রসন্তান দানের জন্য রাজি হয়ে যান। কিন্তু অম্বিকা যখন বেদব্যাসের মুখোমুখি হন, তখন তিনি তাঁর তেজস্বী রূপ দেখে ভয় পেয়ে যান এবং চোখ বন্ধ করে নেন। এর ফলে তিনি ধৃতরাষ্ট্র নামে এক অন্ধ পুত্রের জন্ম দেন। বেদব্যাসকে দেখে অম্বালিকাও ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যান। তার পুত্র পাণ্ডু তাই ফ্যাকাশে বর্ণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

সময়ের সাথে সাথে পাণ্ডুর বিয়ে কুন্তী ও মাদ্রীর সঙ্গে হয়। দেবতার উপাসনার মাধ্যমে তারা পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। ভীম ছিলেন পবনপুত্র এবং তাঁকে হনুমানজীর ভাইও বলা হয়। অর্জুন ছিলেন ইন্দ্রের পুত্র, যুধিষ্ঠির ছিলেন ধর্মরাজের পুত্র এবং নকুল ও সহদেব ছিলেন অশ্বিনী কুমারের পুত্র।

পাণ্ডু অল্প বয়েসেই মারা যান এবং সেই সময়ের সামাজিক প্রথা অনুসারে, পাণ্ডুর সন্তানদের পিতার ভূমিকা ধৃতরাষ্ট্রের নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, তিনি তার ভাইয়ের পুত্রদের নিজের সন্তান বলে মেনে নিতে পারেননি।

ধৃতরাষ্ট্র তাঁর নিজের পুত্র এবং তাঁর ভাই পাণ্ডুর পুত্রদের মধ্যে বৈষম্য করতেন, যার ফলেই মহাভারতের বিশাল যুদ্ধ ঘটেছিলো।

1.2

সঞ্জয় উওয়াচ

দৃষ্ট্বা তু পান্ডাবানীকং(ব্রঁ), ব্যূঢং (ন্) দুর্য়োধনস্তদা।
আচার্য়মুপসঙ্গম্য, রাজা বচনমব্রবীৎ॥1.2॥

সঞ্জয় বললেন তখন বজ্রব্যূহের দণ্ডায়মান পাণ্ডব সৈন্যগণ কে দেখে রাজা দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের নিকটে এই কথা বললেন

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলেন যে পাণ্ডবের সৈন্যকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে দেখে রাজা দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন। এই শ্লোকে সঞ্জয় ব্যঙ্গাত্মকভাবে দুর্যোধনের জন্য "রাজা" শব্দটি ব্যবহার করেছেন, কারণ তিনি রাজপুত্র ছিলেন, রাজা নন। কিন্তু, ধৃতরাষ্ট্র যিনি প্রকৃত রাজা ছিলেন, তিনি দুর্যোধনের হাতের পুতুল ছিলেন এবং সর্বদা দুর্যোধনের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতেন।

তৃতীয় শ্লোক থেকে যুদ্ধের আরো বিবরণ শুরু হয় এবং পাণ্ডবের সেনাবাহিনী দেখে দুর্যোধনের মনে যে ভয় ও নিরাপত্তাহীনতা উৎপন্ন হয়েছিল, তার বিবরণ পাওয়া যায়।

আজকের বিবেচনটি হরিনাম সংকীর্তন, প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং শেষে হনুমান চালিশা পাঠ দিয়ে সমাপ্ত হয়।

:: প্রশ্নোত্তর পর্ব ::

প্রশ্নকর্তা : দীপা দিদি

প্রশ্ন: ছোটবেলা থেকেই আমরা শুনে আসছি যে, সঞ্জয় হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রের পাশে বসে তার দিব্য দৃষ্টির মাধ্যমে যুদ্ধক্ষেত্রে কী ঘটছে তার ভাষ্য দিচ্ছিলেন, কিন্তু আপনি বলেছিলেন যে, তিনি যুদ্ধের একাদশ দিনে যুদ্ধের বিবরণ দেওয়া শুরু করেন। কোনটা ঠিক?

উত্তর: মূল মহাভারত অনুসারে, সঞ্জয় দশম দিন পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন এবং একাদশ দিনে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে তার ভাষ্য শুরু করেন। মহাভারতের মতো গ্রন্থের গল্পগুলি শ্রুতি পরম্পরার মাধ্যমে (শ্রবণের মাধ্যমে শেখার ঐতিহ্য) আমাদের কাছে এসেছে। তাই তার বিভিন্ন সংস্করণ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আমি যা বলেছি তা মূল মহাভারত অনুসারে

এবং সেই কারণেই আমরা গীতা পরিবারে আমাদের সাধকদের সর্বদা মূল গ্রন্থ পাঠ করার জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকি।

আমাদের বিশ্বাস যে আপনার এই বিবেচনাটি পড়ে ভালো লেগেছে। দয়া করে নিম্নে দেওয়া লিঙ্কটি ব্যবহার করে আপনার মূল্যবান মতামত দিন -

https://vivechan.learngeeta.com/feedback/

বিবেচন সারটি পড়ার জন্য, অনেক ধন্যবাদ!
আমরা সকল গীতা সেবী, এক অতুলনীয় প্রত্যাশা নিয়ে, বিবেচনের অংশগুলি বিশুদ্ধ ভাবে আপনার কাছে পৌঁছনোর প্রচেষ্টা রাখি। কোনো বানান বা ভাষারগত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

জয় শ্রীকৃষ্ণ!
সংকলন: গীতাপরিবার – রচনাত্মক লেখন বিভাগ

প্রতি ঘরে গীতা, প্রতি হাতে গীতা!!
Let's come together with the motto of Geeta Pariwar, and gift our Geeta Classes to all our Family, friends & acquaintances

https://gift.learngeeta.com/

গীতা পরিবার একটি নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। এখন আপনি পূর্বে পরিচালিত সমস্ত ব্যাখ্যার (বিবেচনের) ইউটিউব ভিডিও দেখতে পারেন এবং PDF পড়তে পারেন। অনুগ্রহ করে নিচের লিঙ্কটি ব্যবহার করুন।

https://vivechan.learngeeta.com/

|| গীতা পড়ুন, পড়ান ,জীবনে গ্রহণ করুন ||
|| ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ||